ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার যোগাযোগ: একটি পর্যালোচনা

মোঃ নজরুল ইসলাম *

Abstract : The ability to communicate effectively is necessary to carry out thoughts and visions to people. Without communication, there are no way to express thoughts, ideas and feelings. The importance of communication becomes much more crucial when one is on a mission or need to fulfill a goal. Without a means to communicate, you will stand isolated. Allah created man with a basic function to communicate. Prophet Muhammad (peace be upon him) has given high importance to written communication because it could be preserved and be used for future reference. This article underlines the place of communication in Islam. The analysis closely links the historical phases of development of Islam to the development of communication media and modes in society, and highlights the structural relationship between communication as a fundamental human behaviour and the belief in, and the call for, Islam as basically communication oriented religion.

যোগাযোগ ইসলাম প্রচার-প্রসারে একটি অন্যতম পন্থা। আল-কুরআনের মৌলিক অলৌকিকত্ব হলো এর অনুপম বাগ্মীতা ও বাচনিক উৎকর্ষ। এটি এতই অনুপম ছিল যে তৎকালীন আরবের কোন কবি বা বক্তাই এর সমউচ্চতার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেননি। আল-কুরআনের আয়াতসমূহে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের জন্য যোগাযোগের গুরুত্বের কথা প্রায়শই বিধৃত হয়েছে। মানুষের কাছে আল্লাহর এই আহ্বান পৌছে দেয়াকে আল-কুরআনে 'বালাগ'[১] 'দাওয়াহ'[২] 'বাশীর'[৩] 'নাযির'[৪] 'তাজকিয়া'[৫] 'মাওয়িজাহ'[৬] প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আল-কুরআনের ২টি মৌলিক প্রত্যয় হলো 'ওহী' এবং 'ওয়াছওয়াছা' যা মূলত যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ইঙ্গিত করে। 'ওহী' এর অর্থ হলো 'ইশারা করা, লেখা, পয়গাম পাঠানো, মনের উপর সঞ্চার করা, গোপনে বলে দেওয়া ও অপরের মনে উদ্রেক করে দেওয়া।'[৭] আর 'ওয়াছওয়াছা' এর অর্থ 'শয়তানের প্রলোভন'[৮] যা মন্দ পথে নিতে চায়।

যোগাযোগের ধারণা

ইংরেজি 'Communication' শব্দটি ল্যাটিন 'Communis' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'সাধারণ'।[৯] আমরা যখন কারো সাথে যোগাযোগ করি তখন তার সাথে একটা 'সাধারণত্ব' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। এর অর্থ হচ্ছে, তার সাথে তথ্য, ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির আদান-প্রদান করি। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'Communication' এর অর্থ করা হয়েছে এভাবে, আদান-প্রদান, যোগাযোগ, বার্তা, চিঠিপত্র, যোগাযোগের মাধ্যম, সড়ক, রেলপথ, টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশন।[১০] সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে যোগাযোগ বলতে মিলন, ঐক্য, কার্য-কারণের সামঞ্জস্য, যোগ-সংস্রব, খবরাখবরের লেনদেন, দেখাশুনা ও সহযোগিতা বোঝানো হয়েছে।[১১] সংসদ অভিধানে যোগাযোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Communication,

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Unity, Consistency, Connection, Contact, Intercourse and Relation"[১২] অন্যদিকে Oxford English Dictionary তে 'Communication' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "the activity or process of expressing ideas and feelings or of giving people information"[13] এছাড়া Communicate এর প্রতিশব্দ, "Bestow, Confer, Give, Grant, Impart, Announce, Touch, Reveal, Divulge, Disclose, Contact, Intercourse"[১৪] এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী Y.V. Lakshmana Rao তাঁর "Communication and Development" গ্রন্থে যোগাযোগ সম্পর্কে বলেন, "Communication refers to a social process- the flow of information, the circulation of ideas in human society, and the propagation and internalization of thoughts[15] অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যোগাযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী K. K. Sereno এবং C. D. Mortensen বলেন, "Communication is a process by which senders and receivers of the messages interact in a given social context."[১৬] যোগাযোগ বিষয়ক অন্য একজন বিশেষজ্ঞ Karl Hoveland বলেন, "Communication is the process by which one individual transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals"[১৭] অর্থাৎ "যোগাযোগ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন অন্যের আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে 'উদ্দীপক' (সাধারণত বাচনিক সংকেত) পাঠায়"।

সার্বিক বিশ্লেষণে যোগাযোগ বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আদান-প্রদান করে থাকে। পৃথিবীর আদিম সময় থেকেই মানুষের যোগাযোগ ছিল। কালক্রমে যোগাযোগের বিভিন্ন ধরণ ও রুপ পরিবর্তন হয়েছে। কালক্রমে এর ব্যাপকতা আরও বাড়বে। যার সাথে মানুষ প্রতিনিয়ত খাপ খেয়ে আসছে ও আসবে।

যোগাযোগের প্রকৃতি

বর্তমান যুগে যোগাযোগের বিভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যোগাযোগকে আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যার যত বেশি যোগাযোগ সে তত বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে যোগাযোগ থেকে শুরু করে সে যোগাযোগ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সীমানাও ছাড়িয়ে গেছে। মানুষে মানুষে যোগাযোগের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।[১৮] যোগাযোগের এই ভিন্নতার কারণে যোগাযোগের প্রকৃতিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন বিভিন্ন সমাজ বিশ্লেষকরা।

১. যোগাযোগ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া;
২. যোগাযোগ একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া;
৩. যোগাযোগ একটি প্রতিকী প্রক্রিয়া;[১৯]
৪. যোগাযোগ একটি প্রভাবনামূলক প্রক্রিয়া; এবং
৫. যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।[২০]

যোগাযোগের ধরণ

যোগাযোগ এখন কেবলমাত্র স্থল, নৌ কিংবা আকাশ পথের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় যোগাযোগের বিভিন্ন মাত্রার ফলে এখন বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা যোগাযোগ বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করেছেন। সে সকল ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হল-

1. Verbal Communication (বাচনিক যোগাযোগ)
2. Nonverbal Communication (অবাচনিক যোগাযোগ)
3. Oral Communication (মৌখিক যোগাযোগ)
4. Written Communication (লৈখিক যোগাযোগ)
5. Formal Communication (আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ)
6. Informal Communication (অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ)
7. Intentional Communication (উদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ)
8. Unintentional Communication (অউদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ)
9. Small Group Communication (ছোট দলগত যোগাযোগ)
10. Organizational Communication (সাংগঠনিক যোগাযোগ).[২১]

ইসলামের যোগাযোগ সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণ

ইসলামে সামাজিক নীতি ও রাজনৈতিক নিয়মের মূলভিত্তি হলো আল-কুরআন এবং আল-হাদীস।[২২] ইসলামের প্রথম ও প্রধান নির্দেশনা আসে আল-কুরআন থেকে যা ইসলামের মৌলিক নীতি প্রণয়ন করে ইসলামী আচরণের ভিত্তি স্থাপন করে।[২৩] সুন্নাহ বা মহানবী (সা.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন আল-কুরআন প্রদত্ত নীতির ব্যাখ্যাকারী। ইসলামী আইন ব্যবস্থার তৃতীয় আরেকটি স্তম্ভ হলো ইজতিহাদ, যার অর্থ আল-কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে গৃহীত স্বাধীন বিবেচনা।[২৪] ইজতিহাদও যোগাযোগভিত্তিক কেননা তা মৌলিক গ্রন্থসমূহ, ব্যাখ্যাসমূহ এবং দৃষ্টান্তসমূহের তথ্য নির্দেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা হলো ইসলামী আলেমদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত।[২৫] এটিও যোগাযোগভিত্তিক, কেননা এটি প্রসিদ্ধ ইমাম বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরস্পর পরামর্শ ও জ্ঞান বিনিময়ের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধটি ইসলামে যোগাযোগের কেন্দ্রিকতা নিয়ে আলোচনা করবে। সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে এটি মুসলিম সমাজের মৌখিক যোগাযোগ থেকে লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতিতে উত্তরণের বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে। ইসলামের বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী কী ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে আর মানবিক সভ্যতার বিনির্মাণের অনুঘটক হিসাবে মুসলিমরা কী অবদান রেখেছে তা খতিয়ে দেখাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমদের যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিমগণ বেশকিছু সামাজিক বিকাশের মুখোমুখি হন কেননা তারা একটি বিশ্বাসী দল থেকে ক্রমেই একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মৌখিক কথোপকথোনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান।[২৬] মরুভূমির অন্যসব আরবের মতো মুসলিমরাও তখন মৌখিকভাবেই পরস্পর যোগাযোগ করত এবং অপপ্রচার মোকাবিলা করত। যেহেতু কবি ও বক্তাদের তৎকালীন সমাজে বিশেষ সম্মান ছিল। তাই মুসলিমরাও তাদের বাগ্মীতা ও কাব্য প্রতিভার কারণে মর্যাদা পেত। মহানবী (সা.) এর একজন সাহাবী ছিলেন বিখ্যাত কবি যায়িদ বিন সাবিত যিনি কুরআন লিখন

পদ্ধতির কাজ করেন।[২৭] তিনি তাঁর সমস্ত কবিতায় ইসলাম ও রাসূলের মহিমা বর্ণনা করেন। অপর এক মুসলমান কবি কা'ব ইবন যুবাইর তাঁর ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল কবিতার জন্য রাসূল (সা.) এর নিজের পরিধেয় পোশাক উপহার পান তিনিও এ কাজে সহযোগিতা করেন।[২৮] তবে মহানবী (সা.) নিজে ইসলামের দাওয়াতের জন্য কবিতা ব্যবহার করতেন না। তিনি যে কবিতা চর্চা করবেন না বা সে উদ্দেশ্যে কবিতা ব্যবহার করবেন না, সেটিই ছিল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, "আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাই নি এবং এটা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;"[২৯] নবী (সা.) কে কবিতা চর্চা থেকে বিরত রাখার কারণটি খুবই পরিষ্কার। নবীজী যদি কবিতা চর্চা করতেন তাহলে তাঁর কাব্য প্রতিভার জোরে তিনি কুরআন রচনা করেছেন বলে প্রচারণা চলত, আর তাতে আসমানী কিতাবকে মানব রচনা বলে আখ্যায়িত করা হতো। ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা যখন একটি সম্প্রদায় থেকে জাতিতে পরিণত হলো, তাঁরা রাষ্ট্রগঠন করলো,[৩০] তখন তাঁরা লিখিত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিল যা মুসলিম সম্প্রদায় থেকে মুসলিম সভ্যতা বিনির্মাণের পথ খুলে দিল।[৩১]

আল-কুরআন : যোগাযোগের বিস্ময়

আল-কুরআনের অলৌকিকতা যোগাযোগভিত্তিক।[৩২] কুরআনের এই যোগাযোগ মাধ্যম না কোন গদ্য, না কোন পদ্যের ন্যায়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা, শব্দের ঝঙ্কার ও লালিত্য, বর্ণনার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা, সর্বোপরি রসবোধ পবিত্র কুরআনকে যে-কোন ভাষায় রচিত প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থসমূহে স্থান পায়।[৩৩] কাব্য প্রতিভা সমৃদ্ধ আরবরাও কুরআনের এই অনুপম অসাধারণত্বের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। কুরআনের এই অনুপম বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে সেই সময়ের বিখ্যাত কবি আল ওয়ালিদ ইবন আল মুগিরাহ বলেন, মোহাম্মদ যা নিয়ে এসেছে তা কোন স্বর্গীয় দূত, কোন পাগল ব্যক্তি বা কোন যাদুকরের পক্ষেও সম্ভব নয়। নবীজীর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থের কোন সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হয়ে মুগিরা শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, মুহাম্মদ (সা.) এর হয়তো যাদুকরী বাগ্মীতা আছে। তাই তিনি মানুষজনকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন ঐ যাদুকরী বাণী না শোনে। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন মানুষের জন্য এক বিশেষ মু'জিযা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল[৩৪] যার ফলে সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিজয় সহজ হয়েছে। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, "রাসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।"[৩৫]

এইভাবেই কুরআনের সাথে আরব সাহিত্যিকদের তাল মেলাতে না পারাটাই কুরআনের একটি অলৌকিকত্ব। এটাকে বলা হয় যোগাযোগের মোজেযা। কেননা প্রচলিত শব্দ আর বাক্যে লিখিত হলেও কেউই এ ধরণের রচনার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। কুরআনের ধরণ ও ছন্দ যে অনুকরণের সাধ্যের বাইরে তা বোঝাতে গিয়ে আরব্য কবি আল ওয়ালিদ ইবন আল মুগিরাহ বলেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আল-কুরআনে মানব কোন সম্পর্ক নেই।"[৩৬] এই অসাধারণত্ব তৎকালীন অমুসলিমদের বাধ্য করেছিল কুরআনের উপর যাদুর অপবাদ জুড়ে দিতে। তারা রাসূলকে (সা.) এমন বড় কোন যাদুকর বলে অভিযোগ করতে থাকেন যার যাদুই হলো বাগ্মীতা।[৩৭] আল-কুরআনে মানব জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের উত্তর খুব স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে[৩৮] এটা মানব সভ্যতার

যোগাযোগকে আরও আধুনিক করেছে। হযরত ওমর ইবুনল খাত্তাব (রা.)-এর কুরআনের শ্রবণপূর্বক ইসলাম কবুলের ঘটনা এই অলৌকিকতাকে আরও জোরালোভাবে প্রমাণ করে। খুব কাছ থেকে কুরআন শ্রবণের কারণেই ওমর বিন খাত্তাব (রা.) মুসলমান হয়ে যান।[৩৯] সবচেয়ে ভয়ংকর ও হিংস্র মানুষ হয়েও বোন ও ভগ্নীপতির মুখে শুধুমাত্র কুরআন শোনার কারণে সম্পূর্ণ অন্য মানুষরুপে ওমর (রা.)-এর রুপান্তর ছিল সে সময়ের মানুষদের কাছে দারুন বিস্ময়ের কাহিনী। ওমর (রা.)-এর রুপান্তর সম্পর্কে বলা হতো, "তাঁর হৃদয় সুমিষ্ট এবং তাঁর আত্মা ভয়মুক্ত।" হুসাইল হায়কান ওমরের এই বিখ্যাত রুপান্তরের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেন কুরআনকে। তিনি বলেন, "(এই রুপান্তরের কারণ) কুরআনের আহবানের উচ্চমার্গ এবং এর বার্তা সমূহের উদারতা।"

মদীনায় মৌখিক যোগাযোগ

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল মৌখিক। যেহেতু মদিনা রাষ্ট্রটি ছিল ভৌগলিকভাবেই সীমিত, তাই মৌখিক যোগাযোগই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে। নেতা ও অনুসারীরা তখন সরাসরি যুক্ত থাকত, তারা সরাসরি যোগাযোগ করত আর একই সাথে তৎক্ষণাৎ মতামত দিতে পারত। এভাবেই নবীজীর উপর নাযিল হওয়া প্রত্যাদেশ জীবন্ত থাকত উম্মতের মাঝে। কখনও কখনও সাহাবীরা প্রত্যক্ষ করেছেন নাযিলের ঘটনা। তারপর এই প্রত্যাদেশ একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ত এবং সাহাবীরা সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতেন। নেটওয়ার্কের উপমায় বলতে গেলে, মহানবী (সা.) তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্টেশন আর সাহাবীরা সেই কেন্দ্রীয় স্টেশনের বার্তা বহনকারী নেটওয়ার্ক গঠন করেছিল। এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল আরব সম্প্রদায়, যাকে বলা চলে সে সময়ের যোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহ। সেখান থেকে নবীজী ও তাঁর সাহাবীদের কাছে মক্কার খবর পৌঁছে যেত। সেটি এতই মুখ নির্ভর সম্প্রদায় ছিল যে, সেখানে শিক্ষা ও শেখানোর ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.)-এর পাশে বসে নিষ্ঠাবান সাহাবীদের একনিষ্ঠ জ্ঞানার্জন একটি দারুন শিক্ষা পদ্ধতির মডেল তৈরি করে।[৪০] ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে, সাহাবীরা মনোযোগের সাথে রাসূলের কথা ও কাজের অনুকরণ করতো যাকে বলা যায় পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা। তাছাড়া কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে 'নবী আল-উম্মী' অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞানহীন নবী নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৪১] এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যের বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে উহার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"[৪২] একই সূরার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার

অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।"[৪৩] অক্ষরজ্ঞানহীন রাসূল (সা.) শিক্ষার পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিকে উৎসাহ দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন, "প্রার্থনা করো যেমনটি আমাকে করতে দেখ।" এই পদ্ধতির তখন একটি অপরিহার্যতা ছিল, কারণ তখন অধিকাংশ সাহাবীরাই আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না আর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিপুনতা ধরে রাখতেও তার প্রয়োজন ছিল। এই অনুকরণধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা রাসূল (সা.) এর ওফাতের পরও চলমান ছিল। কারণ মানুষেরা কোন নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর উত্তরসূরীদের কাছ থেকে জানতে চাইত রাসূল এমতাবস্থায় কী আচরণ বা কাজ করতেন। এ প্রসঙ্গে নবীজীর স্ত্রী মা আয়েশা (রা.)-এর কথা বলা যায়। তিনি সবাইকে বলতেন, রাসূল (সা.) কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কী করতেন? মদীনার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল 'খুতবা' বা বক্তব্য প্রদান।[৪৪] খুতবা প্রদান আরবদের জন্য নতুন কিছু ছিল না, বরং শত শত বছর আগে থেকেই সভ্যতাগুলো এই পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিল। তবে আরবরা এই পদ্ধতির সাথে অনেক বেশি মানিয়ে নিয়েছিল। বিখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতা এবং কবিদের কবিতা পাঠ আরবে জন্ম দিয়েছিল 'উকাজ মেলার' যেখানে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের বাগ্মীতা প্রদর্শন করত।[৪৫] রাসূল (সা.) সাধারণত মসজিদে খুতবা দিতেন। তবে নানা সামাজিক জমায়েতেও তিনি খুতবা দিতেন। রাসূল (সা.) ও তাঁর উত্তরাসূরী খলিফাদের যুগেও খুতবাই ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগের প্রধান ও কার্যকরী মাধ্যম। এছাড়া প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজে খুতবা দেয়াটা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিতে পরিণত হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও নানা ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের জন্য এটি একটি সাপ্তাহিক মাধ্যম হয়ে দাড়ায়।[৪৬] দুই ঈদের খুতবা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের বাৎসরিক মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হতো। এই ব্যবস্থা রাসূল (সা.) ও তাঁর খলিফাদের সময় পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। এরপর ইসলামী সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃত হলো তখন শুক্রবারের খুতবায় আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী খলিফার আনুগত্য মেনে নিয়ে খলিফাকে মুসলিম উম্মাহর নেতা গণ্য করা হতো। আব্বাসীয় খিলাফতের শেষদিকে এসে যেহেতু খিলাফত ভিন্ন রাজনৈতিক স্বত্ত্বার রূপ পরিগ্রহ করে।[৪৭] তাই শুক্রবারের খুতবা তখন আলংকারিক বা প্রতীকী হয়ে পড়ে এবং সঠিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে।

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে নবীজী (সা.)-এর বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহর বার্তাকে ছড়িয়ে দিতেন। সেই প্রক্রিয়াটি ছিল সেই যুগে বক্তার মতই। তবে প্রপাগান্ডার পরিবর্তে আহবান-প্ররোচনাই ছিল তাঁর কৌশল। তাঁর উপর প্রেরিত বাণী ও মিশনের প্রথম ঘোষণার চেয়ে প্ররোচনাধর্মী যোগাযোগের ভাল উদাহরণ কমই পাওয়া যাবে।[৪৮] নবীজীর সেই বক্তব্যে তিনি আবেগধর্মী না হয়ে বরং যুক্তিপ্রদানের কৌশল প্রয়োগ করেন। তার প্রথম বক্তব্য ছিল 'আরোহমূলক যুক্তির' উদাহরণ কেননা তিনি সবার আগে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত দেন অনেকেই তাতে বিশ্বাস করেন। কারণ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তখন তিনি তাঁদের বলেন, "নিশ্চয়ই আল-রাইদ তার লোকদের মিথ্যা বলে না। এমনকি যদি আমি মানুষের সাথে মিথ্যা বলতামও, তোমাদের মিথ্যা বলব না নিশ্চয়ই। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত রাসূল আর সকল মানুষের জন্যও রাসূল। আল্লাহর কসম, তোমরা মৃত্যুবরণ করবে তত সহজেই যত সহজে তোমরা ঘুমাও,

আর মৃত্যুর পর তোমাদের জবাবদিহিতা করতে হবে তোমাদের কৃতকর্মের, তোমাদের উপার্জিত পণ্য ভাল না মন্দ কাজে ব্যয় হলো তারও জবাবদিহিতা করতে হবে..... ।"

এখানে সুক্ষ্ম যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সরাসরি মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল সভ্যতম উপায়ে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ও পবিত্র হবার আহবান জানাতেন। আরো কিছু বক্তৃতা ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এর মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে জীবনের শেষ হজ্জে প্রদত্ত বক্তব্যটি 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে, যা খুবই বিখ্যাত এই কারণে যে, তাতে সামাজিক, ধর্মীয় ও দৈনন্দিন আচরণের বিশেষ দিকগুলোতে জোর প্রদান করা হয়েছে।[৪৯] যেমন, এই বিদায় হজ্জের ভাষণে নবীজী ইসলাম পূর্ব সময়ের সুদকে তিরোহিত করেন এবং নারীর অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।[৫০] তার কৌশল সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বক্তব্যসমূহে রুপক, উপমা, অলংকারের ব্যবহার যা তার বক্তব্যকে সহজ করত এবং সকলকে আকর্ষণ করত।[৫১] রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, "চারিত্রিক উৎকর্ষের উচ্চমার্গের পরিপূর্ণ বিধানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।"[৫২]

নিম্নবর্ণিত খুতবাটি উপরোক্ত এই কথার যথার্থতা প্রমান করবে, "হে মানুষ, নিশ্চয়ই খোদার সাথে মিলনের পূর্বদিন পর্যন্ত তোমাদের রক্ত ও ধন তেমনি পবিত্র, যেমন আজকের দিন, এই শহর পবিত্র। নিশ্চয়ই প্রতিটি সুদের হিসাব আজ হতে তিরোহিত হলো, তবে তুমি শুধু তোমার মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা অবিচারও করো না, ভুলও করো না। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সুদ থাকবে না।"[৫৩] আজ হতে জাহিলিয়া যুগের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত হলো। আমি রাবিয়াহ ইবন হারিছ ইবন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রের রক্তে প্রতিশোধকে রহিত করার মাধ্যমে শুরু করলাম। হে মানব, শোন আমার কথা, বুঝে নাও, সকল মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; মুসলিমরা ভ্রাতৃসংগঠন। কোন মুসলিম তার ভাইয়ের সম্পদ নিতে পারবে না, যদি তাকে ভালো উদ্দেশ্যে তা না দেয়া হয়। হে মানুষ, আল্লাহ একজনই, তোমাদের পিতা একজনই, তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদম সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে। আজ থেকে তাকওয়ার পরিমান ছাড়া কোন আরবই অনারবের চেয়ে উত্তম বিবেচিত হবে না।

রাসূলের মৃত্যুর পরে আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় প্রদত্ত ভাষণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল একটি মহাসত্য এবং খিলাফতের ধরন কেমন হবে তার দিক-নির্দেশনা। যদিও পুরো বক্তব্যটি ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তবু বক্তব্যের কিছু অংশ ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে তার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে। খুতবা প্রদানের সময় খলিফা ওমর একবার এক মহিলার প্রতিরোধের সম্মুখীন হন এবং মেনে নেন যে, তিনিই ভুল করেছেন এবং ঐ মহিলাই সত্য বলেছেন। উমর জবাবদিহিতার অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যখন খুতবা দানরত অবস্থায় তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বায়তুল মাল থেকে যে পরিমান কাপড় দেয়া হয় তাকে উমরের লম্বা পোশাক কী করে হয়। উমর তাঁর সদুত্তর তখনই প্রদান করেছিলেন।[৫৪]

ইসলামে লৈখিক যোগাযোগ

মানব উন্নয়নে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ লিখিত পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। লিখিত বক্তব্যে প্রকৃতও মানুষের কাছে শক্তিশালী মাধ্যমরুপে বিবেচিত হয়। এ

যোগাযোগের ফলে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যক্তি থেকে সমষ্টি ও সমষ্টি থেকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আলো।[৫৫] লিখিত তথ্যগুলো তুলনা ও বিশ্লেষণ যোগ্য; যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্বানুমান ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই যারা লেখাপড়া জানে না তাদের চেয়ে লেখাপড়া জানা মানুষেরা সাধারণত বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত হয়।

একটি যোগাযোগধর্মী ধর্ম হওয়ায় ইসলাম দ্রুত লিখন পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নেয়। ইসলামের প্রথম নাযিলকৃত শব্দই ছিল পড়, তাই কোরানের আয়াতসমূহ বই আকারে একত্র করা হয়। কোরান শব্দটিই ইঙ্গিত করে যে তা লিখিত যোগাযোগের কেন্দ্রীয় প্রমাণ। 'পড়' শব্দটি এই পবিত্র কুরআনকে অধ্যায়নের আদেশ দেয়।[৫৬] ইসলামের ঘোষণার ফলে মানুষ মাত্রই যে ভুল করতে পারে। তাই লিখিত যোগাযোগটা খুবই দরকার বলে এর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে লিখিত পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে রুপকের সাহায্যে। আক্ষরিকভাবেও বলা হয়েছে যে, 'মানুষের কৃতকর্মসমূহ দুইজন ফেরেশতা দ্বারা লিখিত হয়। লাওহে মাহফুযে সমস্ত মানুষের কৃতকর্ম লিখিত ও মূল্যায়িত হয়।'[৫৭] এছাড়াও মানুষের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা সরাসরি লিখে রাখার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় সরাসরি আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে। সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ লেখার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর তার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করে দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এটা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতো তোমরা কোনরুপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এটা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"[৫৮]

মদীনা শাসন ব্যবস্থায় লিখন নির্ভর যোগাযোগ

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দূরত্ব ও যোগাযোগ একটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাড়ায়। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ মৌখিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই লিখন

পদ্ধতিকে আয়ত্ব করে নেয়াই ছিল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর উত্তম বিকল্প। প্রাথমিক যুগের প্রায় সব মুসলিমই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। তবে নবীজী কিছু লেখাপড়া জানা মানুষের সহযোগিতা পেয়েছেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে।[৫৯] এ সময় রাসূল (সা.) তার কিছু সাহাবীকে লেখার জন্য উৎসাহিত করে বলতেন, "কাঁধে বসে থাকা লিখতে থাকা ফেরেশতাদের আমলনামার সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে।" কিছু কিছু সাহাবী কুরআনের আয়াত লিখে রাখতেন কারণ তারা ভুলে যাবার আশঙ্কা করতেন। আলী (রা.), মুয়াজ (রা.), উবাই (রা.), যাইদ (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের মতো সাহাবীরা কুরআনের প্রায় পুরোটাই লিখে রেখেছিলেন। যদিও তা একটি পুস্তিকা আকারে সংরক্ষিত ছিল না। এসব সাহাবীরা হাড়, পশুর চামড়া, তালের পাতা প্রভৃতিতে লিখে রাখতেন আয়াতসমূহ।[৬০] যদিও শুরুর দিকের মদীনা শাসন ব্যবস্থায় লিখিত যোগাযোগ সীমিত ছিল, প্রয়োজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রসারও ঘটতে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চুক্তি, সন্ধি, যুদ্ধবিরতির শর্ত লিখে রাখা হতো। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধি লিখিত হয়। এছাড়া মদিনা সনদও লিখিত সনদ। এই মদিনা সনদই ইসলামের প্রথম লিখিত সনদ বলে বিবেচিত।[৬১] এটিই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান যাতে লিখিত ছিল অমুসলিমের অধিকার কীরূপ হবে। এছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রাসূল (সা.) আরব নেতাদের পত্র পাঠাতেন। এ সবের অধিকাংশই ছিল ইসলামের প্রতি আহ্বান। এই চিঠিগুলো আল্লাহর বাণী ও যুক্তি দিয়ে লেখা হতো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকানা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিমাণ লিখে রাখা হতে। খেজুর গাছের সংখ্যা, পশুর সংখ্যাও লিখে রাখা হতো। পরবর্তীকালে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অনেক বিষয়ই লিখে রাখা হতো। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, আলী (রা.) রাসূলের লেখকগণের অন্যতম ছিলেন। খলিফাদের সময়ে 'দিওয়ান' নামে কিছু প্রশাসনিক পদ তৈরী করা হয় যারা প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখত।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, খলিফাগণ তৎকালীন বিশ্বনেতাদের সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ করত। নবীজী (সা.) পারস্যের একনায়ক, রোম ও আবিসিনিয়ার শাসকদের আল্লাহর বার্তা পৌছে দিতেন এবং ইসলাম কবুলের আহবান জানাতেন।[৬২] এই পত্রের মতই সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি উক্তি। বর্তমানে সংক্ষিপ্ততা একটি সমস্যার তৈরি করে, তখন ২টি কারণে সংক্ষিপ্ত পত্র পাঠানো হত। ১) আরবি ভাষায় প্রকৃতি ও লিখন সামগ্রীর অপ্রতুলতা; ২) কুটনৈতিক লিখন পদ্ধতি, উদাহরণস্বরুপ রোমের শাসককে প্রেরিত পত্রের কথা বলা যায়। এভাবে ইসলামের বিস্তৃতিই লিখন পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত।

খলিফাদের সময়ে লিখিত যোগাযোগ

সমাজ ব্যবস্থা মৌখিক ব্যবস্থা থেকে লিখিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হলে খলিফাগণ ২ টি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হন।

প্রথমটি হলো কুরআন লিখন। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রাসূল (সা.) এর বহু সাহাবী শহীদ হন, যারা কুরআন মুখস্থ রেখেছিলেন।[৬৩] এ অবস্থা কুরআনের লিখে রাখার জন্য আবু বকরকে (রা.) অনুরোধ করা হয়। আবু বকর (রা.) তখন এই প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে সকল সাহাবীর সাথে কথা বলে নেন, কেননা তার আশঙ্কা ছিল যে মানুষেরা ভুলে যাওয়া স্বভাবের কারণে কুরআনে ভুল কিছু ঢুকে পড়বে কিনা বা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ

ভুল বলবে কিনা বা মানবের স্পর্শ পেয়ে তার নিপুণতা বিতর্কিত হবে কিনা। এরপর খলিফা আবু বকর (রা.) রাসূলের অন্যতম প্রধান সহচর যায়িদ ইবন সাবিতকে ওহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৬৪] যায়িদ এই কাজকে বলেন যে, তা ছিল পর্বতকে সরানোর মত কঠিন। যাই হোক, যায়িদ সমস্ত আয়াত সমূহকে সূরা, আয়াতে ভাগ করে একটি বইয়ে রূপদান করেন। সেই কুরআনে আবু বকর (রা.) নিজের কাছে রাখেন এবং পরবর্তীতে উমর (রা.) কে হস্তান্তর করেন।[৬৫]

দ্বিতীয়টি যোগাযোগ সমস্যা ছিল ক্রমবর্ধমান মদীনা সম্প্রদায়ের পাঠের ধরণের ভিন্নতা। আরবি ভাষার উপভাষাগত ভিন্নতার কারণে শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ ভিন্ন হয়ে যেত।[৬৬] এই অর্থগত ভিন্ন নানা ব্যাখ্যার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। খলিফা উসমান (রা.) এর সময় এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। নব্যবিজিত মুসলিম রাজ্যের মুসলমানরা ভিন্ন ভিন্ন আরবি উপভাষায় উচ্চারণ করত। এই ব্যাপারটি লক্ষ করে খলিফা উসমান লেখকগণকে প্রমিত ভাষায় একটি গ্রন্থ লিখতে বলেন। যখন কাজটি সম্পন্ন হয়, তখন তা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। তাই খলিফা ওসমানকে জামিউল কুরআন বলা হয়।[৬৭] একই ধরণের পঠনরীতি অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিকভাবে বলতে গেলে, ভিন্ন সমাজে শব্দের ভিন্ন অর্থ হয়, ভিন্ন উচ্চারণ অনেক সময় ভিন্ন শব্দকে ইঙ্গিত করে। তাছাড়া ঘটনা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শব্দের অর্থও পাল্টে যায়। ইসলাম সে সময় যেহেতু নানা ধরণের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়েছিল তাই মূল গ্রন্থের প্রমিতকরণ এবং তা সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রমিতকরণের কারণে ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভিন্ন রাজনীতির উদ্ভবের হাত থেকে প্রাথমিকভাবে ইসলাম রক্ষা পায়। তাই খলিফা ওসমানের এই উদ্যোগ মুসলিম উম্মাহকে ভিন্নতার মুখে দাড়িয়ে একত্র করার কাজটি করে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও একক অর্থের মাধ্যমে সংহতি বিধানের পথ রক্ষিত থাকে।

লিখিত যোগাযোগের উন্নতির ক্ষেত্রে খলিফা হযরত উমর (রা.) এর বিশেষ অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য। রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী খলিফা উমর 'দিওয়ান' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাদের কারণে নানা প্রশাসনিক ইউনিটের সাথে যোগাযোগের এবং তা সংরক্ষণ। এটিই ছিল ইসলামের প্রথম লিখিত আর্কাইভ। এ ধরণের কিছু দপ্তর হলো-'দিওয়ান আল যুন্দ, দিওয়ান আল খারাজ, দিওয়ান আল বায়তুল মাল, দিওয়ান আল বারিদ ইত্যাদি।' দিওয়ান আল বারিদের কাজ ছিল পত্র যোগাযোগ। এই অধিদপ্তরই সর্বপ্রথম খলিফার সাথে আঞ্চলিক গভর্ণর ও প্রশাসকদের সম্পর্ক বিধান করে। যদিও রাসূল (সা.) এবং আবু বকরও চিঠি লিখতেন, তবুও উমর (রা.) ই পত্র যোগাযোগকে রাজনৈতিক কর্মব্যবস্থার অঙ্গ করে ফেলেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.) দূর-দূরান্তের শাসক, প্রশাসক, সেনাপতিদের সাথে যোগাযোগ করতেন। মৌখিক পদ্ধতি যুদ্ধ পরিকল্পনা বা রাজপরিকল্পনা জানানোর উপযোগী ছিলনা। তাই তিনি বিস্তৃত বিবরণ যুক্ত চিঠি লিখতেন। মুসা আল আশআরীকে লেখা বিচার ব্যবস্থার চিঠি এবং সা'দ বিন আক্কাসকে লেখা সামরিক চিঠি ইতিহাসে সমাদৃত। এই সামরিক পত্র কমান্ডার ও সৈনিকদের যুদ্ধকালীন কৌশলও করণীয় বর্ণনা করেছিল।

খলিফা ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.) যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসেন, তখন ইতোমধ্যেই লিখন পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি হিসেবেই পান। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা

তখনকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক স্থিরতা এবং রাজনৈতিক একতা ধরে রাখতে সহযোগিতা করে।

হাদীস লিখন

রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ মুসলিমদের মূলনীতির দ্বিতীয় প্রধান উৎস। রাসূলের জীবদ্দশায় হাদীস লেখার প্রয়োজন ছিল না বললেই চলে। কারণ, রাসূল (সা.) এর কাছে গিয়ে সবসময় যে কোন সমস্যার ফয়সালা নেয়া যেত। সে সময় হাদীস লেখা অনেক বিতর্কিত ব্যাপার ছিল। অনেক ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) একে নিরুৎসাহিতও করেছেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর লেখার অনুমতি ছিল। প্রথম দুই খলিফা উমর (রা.) ও আবু বকর (রা.) ও অনুৎসাহ প্রদান করেন। কারণ তখন কুরআন লেখা হচ্ছিল, তাই মিশে যাবার সম্ভাবনা ছিল আর তাদের সমমর্যাদা দেবার প্রচলনের আশঙ্কা ছিল। রাসূলও একই কারণে শুরুতে অনুমতি না দিলেও পরবর্তীতে করার অনুমতি দেন। তাই রাসূলের জীবনের শেষ দিকে এসে সাদ বিন উবাইদাহ আল আনসারী, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ এবং আবু হুরায়রা (রা.) নবীজীর বহু কথা লিখে রাখেন।[৬৮] হিজরী প্রথম শতকে হাদীস লেখার কোন আনুষ্ঠানিক নীতি ছিল না। তখন মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্নমতের উদ্ভব হলে ইজমার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। উমর ইবন আব্দুল আযীযের (৭১৭-৭২০) সময়ে তিনি প্রথম হাদীস সংকলনের প্রথম আনুষ্ঠানিক নীতি গ্রহণ করেন।[৬৯] খলিফা কিছু ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয় সঠিকভাবে হাদীস সংগ্রহ করে লেখার জন্য। কেননা তিনি তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের মৃত্যুর সাথে সাথে এই মহাজ্ঞানের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। খলিফার এই প্রবণতাই মুহাদ্দিস যুগের সূচনা করে। তাই মুহাদ্দিসগণ ইসলামিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণকে কাজে লাগান সঠিক হাদীস খুজে বের করতে। কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয় রাসূলের বাণী ও কর্মকে লেখার জন্য। আর কিছু আলেমদের খলিফাদের সময়ের ঘটনাবলীও লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়।[৭০] এই বিপুল জ্ঞানের অধিকারী মুসলিম পন্ডিতরাই আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞানরাজ্যে রেঁনেসাঁ নিয়ে আসে।

উপসংহার

ইসলামের কেন্দ্রে রয়েছে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ার মূলে যোগাযোগ একটি অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের প্রধান উৎস আল-কুরআন ও হাদীস ছাড়াও ইজমা ও ইজতিহাদ যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান। একটি সম্প্রদায় থেকে বৃহৎ জাতি গঠনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় ইসলাম মৌখিক পদ্ধতি থেকে লিখিত পদ্ধতির যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) এর মদীনা যুগে মৌখিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল যা প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চার খলিফার সময়ে ইসলামী রাজ্যের বিস্তারের সাথে সাথে লিখিত পদ্ধতি পূর্বতন পদ্ধতির জায়গা দখল করে। আজ অবধি ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামের নির্দেশিত ও প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ
আল-কুরআন, ৩৬ : ১৭

২. ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

৩. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
আল-কুরআন, ১৬ : ৩৬

৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৩৬

৫. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ
আল-কুরআন, ২ : ১২৯

৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫

৭. মাওলানা এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, *মু'জিযাতুন নবী (সা.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ : ২০১২, পৃ. ২৮৪

৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত) *তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন*, (অষ্টম খণ্ড), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ : জুন ২০০০, পৃ. ৯০৪

৯. Schramm, Wilbur, "Communication: Concepts and Processes," *How Communication Works*, De Vito, Joseph A (ed.), (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, USA, 1971) p. 3

১০. Zillur Rahman Siddiqui (ed.), *English to Bangla Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, 2nd Edition: 2011, p. 152

১১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সঙ্কলিত, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, অষ্টাদশ মুদ্রণঃ জুন ১৯৯৫, পৃ. ৫৯৯

১২. Mohammad Ali (ed.), Bengali-English Dictionary, Dhaka: Bangla Academy, First Edition: 1994, p. 696

১৩. A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Sally Wehmeier (Ed.) & Phonetics Michael Ashby (Ed.), Sixth Edition: 2005, New U. K. edition 2005. p. 237

১৪. *Dictionary of Synonyms and Antonyms*, New Delhi: The Oxford & IBH Publishing Ltd, Third print-1994, p. 75

১৫. Y.V. Lakshmana Rao, *Communication and Development: A study of Two Indian Villages*, Minneapolis: USA: University of Minnesota Press, 1966, p. 145

১৬. Sereno, K K et al, *Foundations of Communication Theory*, UK: Published by Haper & Row, 1970, p. 3

১৭. Carl I. Hovland et al, *Communication and Persuasion,* USA: Yale University Press, First Edition, December 1953, p. 16

১৮. Muhammad Ruhul Amin, *Science Philosophy and Religion,* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, First Edition. 1979, p. 112

১৯. P.R.R. Sinha, "Towards a Definition of Development Communication", *Southeast Asian Journal of Social Science,* Vol. 4, No. 2, Special Issue: "Communication and Social Development in Asia" (1976), Published by: Brill, p. 2

২০. এ এস এম আসাদুজ্জামান ও খালেদ মুহিউদ্দীন, *যোগাযোগের ধারণা*, ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০১, পৃ. ৪৭

২১. Lary L. Barker, *Communication,* Auburn University, (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 5th Edition, 1971), p. 26

২২. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *ইসলামিক আইনবিজ্ঞান ও মুসলিম আইন*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২৪. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃ. ২৬৯

২৫. আহমদ হাসান (নুরুল আমিন জাওহার অনূদিত), *ইসলামে ইজমা দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাম ২০০৪, পৃ. ১৫

২৬. Hamid Mowlana, *Theoretical Perspectives on Islam and Communication,* China Media Research, 3(4), 2007, p. 26

২৭. সামসুদ্দীন, *ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩, পৃ. ৫১

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২৯. আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৯। [সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, আল-কুরআনুল করীম, **ঢাকা:** ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮, বিয়াল্লিশতম মুদ্রণ অক্টোবর ২০১০।]

৩০. S. M. Imamuddin, '*Arab Muslim Administration* (622-1258), New Delhi: Kitab Bhavan, 1984, p. 19-20

৩১. Wilfred Cantwell Smith, *On Understanding Islam,* Delhi, Idarah-1 Adaybiyat-1 Delhi, First Print-1981, p. 19

৩২. Ali Tabari and A. Mingana D.D, *The Book of Religion and Empire,* New Delhi: Kitab Bhavan, 1986, p. 34

৩৩. অনুবাদকবৃন্দ ও ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৪৪৪

৩৪. J. J. Saunders, *A History of Medieval Islam,* London: Routledge and Kegan Paul, 1965, p. 27

৩৫. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ
আল-কুরআন, ১৬ : ৩৫

৩৬. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম ও ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, *আল-কুরআনের অলৌকিকতা*, *আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃ. ১২৯। (মূল প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত); আ'য়াদ, আল কাদী, আবুল ফযল আলশিফা ফি-তা'রিফি হুকুকিল মুসতাফা, পৃ. ২১৭

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩৮. Dr. Mahar Abdul Haq, *Educational Philosophy of the Holy Quran*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, First Edition: 2002, p. 78

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (৬ষ্ঠ খণ্ড), ('উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা.) দ্রষ্টব্য), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৯, পৃ. ২৩

৪০. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে-২০১১, পৃ. ১৬৯

৪১. খুরশিদ আহ্‌মদ সম্পাদিত ও মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার অনূদিত, *ইসলামের আহবান*, (টি. বি. আয়ারভিং, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক দায়িত্ব), ঢাকা: ইফাবা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭, পৃ. ৯৬

৪২. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

৪৩. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
আল-কুরআন, ৭ : ১৫৮

৪৪. Stephan Dähne and ذافد يتس اذاد, *Qur'anic Wording in Political Speeches in Classical Arabic Literature*, Journal of Qur'anic Studies, Vol. 3, No. 2 (2001), Published by Edinburgh University Press on behalf of the Centre for Islamic Studies at School of Oriental and African Studies. p. 1

৪৫. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, প্রকাশকাল-১৯৭২, পৃ. ৩২

৪৬. জামাল খান ও মোঃ নজরুল ইসলাম, "ইসলামের ভূ-রাজনীতিক প্রসরণ ও বৈশ্বায়ন: একটি স্থানিক-কালিক বিশ্লেষণ", *The Journal of Geo-Environment*, Department of Geography and Environmental Studies, Rajshahi University, Vol. 8, 2008, p. 73.

৪৭. J. J. Saunders, *A History of Medieval Islam*, London: Routledge and Kegan Paul, 1965, p. 103

৪৮. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ-১০৮, সূরা ফুসসিলাত-৩৩, সূরা আল-নূর-৫১, সূরা হাদীদ-৮, সূরা নাহল-১২৫, সূরা আনফাল-২৪, সূরা বাকারা-২২১, সূরা মায়িদা-৬৭, সূরা আরাফ-৯৩, সূরা আল-জিন-২৮, সূরা আল-হুদ-৫৭, সূরা সাফ্ফ-১৩ আয়াত সমুহ দ্রষ্টব্য।

৪৯. Ali Tabari and A. Mingana D.D, *The Book of Religion and Empire,* New Delhi: Kitab Bhavan, 1986, p. 34

৫০. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, (ড. রশীদুল আলম অনূদিত) *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, ঢাকা: আয়েশা কিতাব ঘর, প্রথম সংস্করণ-২০০২, পৃ. ১৭২

৫১. তারিখে খাইয়াত মিসরী, ২য় খণ্ড (আবদুল কাইয়ুম নদভী, (আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত) *মহানবীর ভাষণ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১০, পৃ. ৩৪।)

৫২. بعثت لاتمم مكارم الاخلاق বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃ. ৬৯২। (ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃ. ১০৮।)

৫৩. সৈয়দ আলী আহসান, *মহানবী (সা.)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রকাশকাল-১৯৯৪, পৃ. ২৭৯

৫৪. আল্লামা তালিবুল হাশেমী, (হাফেজ মাওলানা মুফ্তী মোহাম্মদ নূর উদ্দিন অনূদিত) *বিশ্বনবী (স.) ও চার খলিফার জীবনী*, ঢাকা: আল-হেরা প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০৪, পৃ. ২৩৬

৫৫. Hamid Mowlana, *Theoretical Perspectives on Islam and Communication,* China Media Research, 3(4), 2007, p. 30

৫৬. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন (ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত), *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা: ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০১, পৃ. ২৪৮

৫৭. (সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।) আল-কুরআন, ৮৬ : ২২

৫৮. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৫৯. অনুবাদকবৃন্দ ও ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ২৯২

৬০. মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *হযরত ওসমান (রা.)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, চতুর্থ প্রকাশ-১৯৯৪, পৃ. ৫৩

৬১. অনুবাদকবৃন্দ ও ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৩১২

৬২. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, (অনুবাদ ব্যবস্থাপনায়-মুহাম্মদ ইবরাহীম ভুঁইয়া) *রাসূল (সা.) এর সরকার কাঠামো*, (নবী (সা.)-এর বেসামরিক প্রশাসন), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪, পৃ. ২২২

৬৩. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫, পৃ. ৪৭

৬৪. মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও মোহাম্মদ এয়াকুব আলী, *যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও কুরআন সংকলনে তাঁর অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (এপ্রিল-জুন ২০০১, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, ৪০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা), পৃ. ৭

৬৫. দ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫, পৃ. ৪৮

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৬৭. মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *হযরত ওসমান (রা.)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, চতুর্থ প্রকাশ-১৯৯৪, পৃ. ৫২

৬৮. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *উলূমুল হাদীস*, (হাদীস ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩২

৬৯. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৬, পৃ. ৩৭৮

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬